দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পর্কের খতিয়ান

দ্বিতীয় অধ্যায়

লোকসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ : সম্পর্কের খতিয়ান

।। এক ।।

লোকসাহিত্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক কতটা সুদূরপ্রসারী, বা কতটা অন্তরঙ্গ, সেটা বলার আগে লোকসাহিত্য কি, বা লোকসাহিত্য কাকে বলে, এমন কি কোন কোন বিষয়গুলো লোকসাহিত্যে অন্তর্গত তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। 'লোকসাহিত্য' শব্দটি 'লোক' ও 'সাহিত্য' দুটি শব্দকে নিয়ে সন্ধিবদ্ধ ভাবে গঠিত, অর্থাৎ লোকের সাহিত্য, লোকের দ্বারা সৃষ্ট সাহিত্য, লোকের জন্য সাহিত্য তা লোকসাহিত্য। প্রকৃত পক্ষে লোকসাহিত্য লোকজীবনেরই ফসল। সমালোচকের ভাষায় এভাবে বলা যায় – "It is essentially of the people, by the people and for the people."[১] এই লোকসাহিত্যের 'লোক' শব্দটি এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই লোক কারা, কোথায় তাদের বসবাস, তা জানা প্রয়োজন। এই আলোচনার পরিধি সীমিত হওয়ায়, এখানে লোক ও সাহিত্যের বিষয়টা সংক্ষিপ্ত আকারে জেনে নেওয়া যাক।

একদিকে ডঃ সনৎকুমার মিত্র তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'লোক' শব্দটির অর্থ ও তার পরিধি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে – ''অভিধান 'লোক' শব্দের অন্যতম অর্থ বোঝাচ্ছেন 'মানুষ'। 'লোক' কথাটিকে বিশেষার্থে বা যোগরূঢ়ার্থে গ্রহণ করতে হবে। কথাটাকে একটু স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। এখানে 'লোক' বলতে সমগ্র মানবজাতিকে বোঝানো হবে না। এমন কি সমগ্র মানবজাতির অন্তর্গত এক পৃথক জাতিকেও (য়ুরোপীয়, এশিয়া, আফ্রিকান, ইত্যাদি – বা তারও ভগ্নাংশ ভারতীয়, চৈনিক, আরবীয়, ইত্যাদি – বা তারও ও ভগ্নাংশ বাঙালি, বিহারী, মারাঠী, অসমীয়া ইত্যাদি) গ্রহণ করবো

না। আমরা 'লোক' বলতে বুঝবো এমন একটি সঙ্ঘত সমাজ যে তার নিজস্ব জন-অংশের (racial) মধ্যে থেকেও তাদের সঙ্গে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভেতর দিয়ে চিরাচরিত প্রথায় আপন বিশিষ্টতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে বা পেরেছে।"[২] অন্যদিকে 'folk' শব্দের আভিধানিক অর্থ 'লোক'। তাই 'flok' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোক' শব্দটি ব্যবহৃত। লোকসংস্কৃতির নানাবিধ আলোচনা প্রসঙ্গে এর বিশেষজ্ঞরা এই 'লোক' কোন সমাজের তা নিয়ে নানান রকম অভিমত পোষণ করেন। তাঁদের মতে – " (ক) সংঘবদ্ধ লোকগোষ্ঠী, আদিম উপজাতীয় লোকগোষ্ঠী, নিম্নশ্রেণির প্রাকৃত জনগোষ্ঠী। (খ) অভিজাত তথা সভ্যসমাজের প্রত্যন্তবর্তী অপেক্ষাকৃত নিম্নতর শিক্ষা, বুদ্ধি ও সংস্কৃতিজীবী মানুষ (গ) এছাড়া অনেক সময় 'লোক' তথা 'folk' শব্দের দ্বারা সুসভ্যদেশের নিরক্ষর সাধারণ লোককে বোঝানো হয়।"[৩] অর্থাৎ এই লোক একটি নির্দিষ্ট সমাজে বসবাসকারী মানুষ নয়। তারা যে কোনও লোকসমাজের অন্তভুক্ত হতে পারে, তাই এই লোকসমাজের পরিধি নিয়ে নির্দিষ্ট কোনও সীমারেখা টানা যায় না। নিম্নশ্রেণির প্রাকৃত জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে সুসভ্যদেশের নিরক্ষর সাধারণ মানুষ পর্যন্ত এই শ্রেণিভুক্ত। তাদের মুখে মুখে চর্চিত অলিখিত উপাদান লোকসাহিত্যের প্রাণ বা প্রধান বিষয়। 'লোক' শব্দটির অন্তর্গত সমাজ, বাইরের যে কোনও সমাজ-সম্প্রদায়-গোষ্ঠী বা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট সংস্কৃতির নিত্য পরিবর্তীত নতুন নতুন উপাদান নিজেদের মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে লোকসমাজকে বা নিজেদেরকে উপযোগী করে নেয়। এইখানেই এদের বিশিষ্টতা ও স্বকীয়তাও। আর লোকসমাজের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতে এই সৃজনশীল লোকসাহিত্যের জন্ম। এই সৃষ্টি সংহত লোকসমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তি বিশেষের একক সৃষ্টি নয়। যা এই লোকসমাজের একান্ত মনের মধ্যে তৈরি হওয়া ফসল। কিন্তু অনেক সময় লোকসমাজ বাইরের সকল প্রকার সমাজ সংস্কৃতি থেকে বিভিন্ন প্রকার উপকরণ সংগ্রহ করে নিয়েও নিজেদের

বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে। এ প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতামত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে – ''একদিকে লোকসমাজ যেমন বহু প্রাচীন আচার-আচারণ বিশ্বাসকে রক্ষা করে চলে, তেমনি আবার অন্যদিকে সমসাময়িক অনেক কিছুকেই গ্রহণ করে। লোকসাহিত্যের মধ্যেও লোকসমাজের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটি স্ফুটতর হয়ে থাকে। অথচ আদিম-সমাজ বাইরের সমস্ত কিছুকেই দূরে পরিহার করে কেবলমাত্র আপন সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে বজায় রাখতে চেষ্টা করে। অপর কোনও সংস্কৃতি থেকে নতুন কিছু গ্রহণ করার আগ্রহ বা ক্ষমতা তার নেই। পণ্ডিতেরা অনেকেই এ বিষয়ে একমত।''[৪] সুতরাং লোকসমাজের মধ্যে পারস্পরিক লোকউপাদান গ্রহণ করবে, এমনটি জোর করে বলা যাবে না। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তাদের পরস্পরের রুচি ও চাহিদার ওপরে।

আবার অপর দিকে ডঃ মানস মজুমদার, তাঁর 'লোকঐতিহ্য-চর্চা' গ্রন্থে অন্তর্গত 'বাংলা লোকসাহিত্যে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর' নামক প্রবন্ধে লোকসাহিত্যের 'লোক' শব্দের পরিধি ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে – ''লোকসাহিত্যের আলোচনায় 'লোক' শব্দে ব্যক্তিবিশেষকে বুঝবো না। বুঝবো সংহত সমাজবদ্ধ একদল মানুষকে, যারা নির্দিষ্ট এক একটি ভূ-খণ্ডের বাসিন্দা, একই অর্থনৈতিক কাঠামোর অধীন এবং সমজীবনচর্যার অধিকারী।''[৫]

এবার আসা যাক 'সাহিত্য' নামক শব্দটিতে। এখানে সাহিত্য কি, তা বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এ বিষয়ে নানা মুনির নানান মতভেদ আছে। তাই একুশ শতকের দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে, সাহিত্য কি, এই বিষয়টি সকলেই মোটামুটি ভাবে জানেন বলে ধরে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গে এগিয়ে যাব। তবে লোকসাহিত্য বলতে আমরা সাধারণ ভাবে বলি যে, লোক অর্থাৎ লোকসমাজে বসবাসকারী সাধারণ মানুষের মুখে মুখে নিত্য নতুন ভাবে চর্চিত এবং প্রচলিত অলিখিত সাহিত্য। এক কথায় বলা যায় primitive and

indigenous culture of loyer section society. আমেরিকার বিখ্যাত লোকবিদ Maria Leach লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে ..... "Folklore may be said to be a true and direct experession of the mind of primitive man."[৬]

কোন কোন বিষয়গুলো লোকসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত, সেই দিকে একটু সংক্ষিপ্তাকারে আলোকপাত করার প্রয়োজন আছে। এক একটি লোকসমাজের সৃজনশীল কর্ম ফল হল এই লোকসাহিত্য। সভ্যতার জন্মলগ্ন থেকে আজও পর্যন্ত এই সাহিত্যের সৃষ্টি অনবরত ভাবে হয়ে চলেছে। লোকসমাজের প্রয়োজনেই এর ধীরে ধীরে উদ্ভব। তবে কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে, প্রয়োজনের তাগিদে লোকসাহিত্যের উত্থানের সূচনা হয়েছে। আর ক্রমে ক্রমে সভ্যতা যতই সংস্কৃতির এক একটি সোপান অতিক্রম করছে, ততই একে একে জড়ো হয়েছে নানা লোক- উপাদান। এই ভাবে আরো সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে। এই ভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সংগৃহীত লোকউপাদান মেয়েলি ছড়া বা ছেলেভুলানো ছড়া। এই মেয়েলি ছড়া থেকে যে কোনও দেশের লোকসাহিত্যের সূচনা পর্ব। কারণ সারাদিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করার পর ক্লান্ত জননী, যখন নিজের শিশুর দুরন্তপনাকে নিরস্ত করতে, নিজের অজান্তেই বানিয়ে বলা লাইনের শেষে মিলযুক্ত কিছু শ্রুতিমধুর শব্দ যেদিন সাজিয়ে দেয়, এবং তা দিয়ে শিশুকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যায়, সেই দিনই প্রথম লোকসাহিত্যের জন্মলগ্ন। শুধু মেয়েলি ছড়া নয়, সভ্যতার ক্রম উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আরো অন্যান্য উপকরণ এই সাহিত্যের খাতায় সূচিবদ্ধ হয়েছে। সেগুলি - ছড়া, রূপকথার গল্প, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা বা হেঁয়ালি, কবিওয়ালের গান, লোককথা, লোককাহিনি, লোকবিশ্বাস, এবং ব্রতকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই উপাদানগুলোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কতটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সেটা আমরা দেখব।

ইংরাজি Folkore কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'লোকসাহিত্য' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লোকসংস্কৃতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখার মধ্যে লোকসাহিত্য নামক শাখার গুরুত্বও অধিকতম। এই শাখার বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে প্রাকৃত জনগোষ্ঠীর সমাজ সংস্কৃতির ঐতিহ্য সুপ্ত অবস্থায় লুকিয়ে আছে। যা আবিস্কৃত হয়েছে, তা পাঠ করলে সহজে বোধগম্য হবে। আর এই সুপ্ত থাকা সাহিত্যের রস রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন। নিজে জেনে বা না জেনেই আশৈশবকাল থেকে এই লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। ছেলেবেলার কথা স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে তা উল্লেখ করে। তিনি বলেন, – ''আমরা বাইরের বারান্দায় ঘটীর জলে পা ধুয়ে দিদিমাকে টেনে নিয়ে বিছানায় উঠতুম। সেখানে শুরু হত দৈত্যপুরী থেকে রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে আনার পালা।''[৭] অর্থাৎ ছেলেবেলায় দিদিমার কাছ থেকে সম্ভাবত তাঁর এই শাখার প্রথম পাঠ শুরু। শুধু দিদিমাই নয়, ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরের মহিলাদের সঙ্গে তাঁর সুগভীর যোগ ছিল, এবং সেখানে মহিলাদের পরস্পরের মধ্যে নানা ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যবহৃত লোকউপাদান তিনি খুব সহজেই আয়ত্বও করেন। এছাড়া বাড়ির ভৃত্য এবং বাড়িতে আসা বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা নানা গল্পকথা লোকসাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর আগ্রহের রসদ জুগিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ নগর কলকাতার সন্তান, ফলত সেখানে লোকসংস্কৃতির উপকরণ পাওয়া সবচেয়ে বেশি দুঃসাধ্য ব্যাপার। ছেলেবেলায় গ্রামীণ প্রকৃতির সান্নিধ্য তেমনভাবে কবি পাননি। পেয়েছিলেন জমিদারি দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববঙ্গে যাবার পর। কিন্তু মাটির ব্রাত্য জীবনের সঙ্গে তাঁর আংশিক এবং প্রথম যোগ হয়েছিল ঠাকুরবাড়ির চারপাশের প্রকৃতির মধ্যে দিয়ে। এ প্রসঙ্গে ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, – ''আমাদের পরম সৌভাগ্য, রবীন্দ্রনাথের শৈশবে ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে প্রকৃতির কিছু যোগ ছিল। ..... তখন বাড়িতে দুটি বাগান

ছিল, একটি মহর্ষিভবনের পূর্বদিকে এবং অপরটি তার দক্ষিণ দিকে। দক্ষিণের বাগানের শান বাধানো পুকুর ছিল।"[৮] আর এই বাড়ির চারপাশের অল্পতম পরিবেশ তাঁকে রূপকথার রাজ্যে মাঝে মাঝে নিয়ে যেত। কারণ ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন খাঁচায় বন্দি পাখির মতো, ভৃত্যের দ্বারা পরিচালিত একটি রসহীন জীবন। এ জীবন রসময় করে তুলেছিলেন তিনি ঠাকুরবাড়ির চৌকাঠ পেরোনোর পর, এবং জমিদারি পরিদর্শনের মধ্য দিয়ে। তিনি প্রাণ ভরে অনুভব করেছিলেন প্রকৃতির রূপ এবং প্রাকৃত জনের দিন আনা দিন খাওয়া জীবনকে।

।। দুই ।।

বিশ শতকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু করেন, তখনও সাধারণ পাঠক, এমন কি উচ্চ সমাজের সুশিক্ষিত মানুষ, তথা বুদ্ধিজীবীরাও এর প্রতি তেমন ভাবে আগ্রহ দেখায় নি। তাই এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, – "বাঙালি বিদেশী ইতিহাস সম্পর্কে যতখানি সচেতন, স্বদেশ সম্পর্কে ততখানি নন।"[৯] এ কথাটিকে একুট ব্যাপক অর্থে বলা যায় যে, নাগরিক সাহিত্যের পাশাপাশি যে গ্রাম্যসাহিত্য রয়েছে, তার সম্পর্কে বাঙালি চিরকালই উদাসীন, এবং অবহেলায় সে যে বস্তুকে বহুদূরে সরিয়ে রেখেছে। এই সাহিত্য ধারাতে বাঙালি হিসাবে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে প্রথম হস্তক্ষেপ করেন, এবং এটিকে একটি ভাবনার বিষয়বস্তু রূপে সকলের সম্মুখে তুলে ধরেন। এর আগে এমনটি কেউ ভাবেননি। এই অনুভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ উচ্চত্তর সাহিত্যের সঙ্গে লোকসাহিত্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি বিবৃতি দিয়েছেন, তা এখানে উল্লেখ করা প্রণিধানযোগ্য, – "গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্র সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণ রূপে দেশীয় স্থানীয়। তাহা

কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকাটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এই রূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। সে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডাল পালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলার তুলনায় হয় না; তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহার সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"[১০] আবার অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চার বিষয়ে বরুণকুমার চক্রবর্তী 'বাঙালার লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে আবিস্কারকের সুযোগ ও সুবিধার তথ্য উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে – ''রবীন্দ্রনাথ লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রথাগত শিক্ষার কোনও সুযোগ পান নি। পরাধীন ভারতবর্ষে সে ধরণের কোনও বিদ্যা শৃঙ্খলাই ছিল না। অথচ শৈশবের স্মৃতি, পূর্ববাংলার গ্রামীণ ঐতিহ্যের অভিজ্ঞতা এবং আন্তরিক বিশ্লেষণের আকাঙ্খা লোকসংস্কৃতি চর্চার সেই প্রাথমিক যুগেও রবীন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে অগ্রপথিক করে তুলেছে।"[১১] সুতরাং তাঁর দৃঢ় অনুশীলন ও লোকজীবনের প্রতি অটুট ভালোবাসা ও সহানুভূতি ছাড়া এ ধরণের চর্চা সম্ভব নয়। যেটা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। আর এই অনুভূতির ফসল তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থটি।

প্রথমে আসা যাক রবীন্দ্রনাথের ছড়া বিষয়ক ভাবনাতে। ছড়ার মধ্যে যে মধুর রস আছে তা রবীন্দ্রনাথ নিবিড় ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। সেই টানে লোকসমাজের মুখে মুখে প্রচলিত কিছু কিছু লোকউপাদান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি যেন নতুন করে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। নিজের ভালোলাগা, মন্দলাগা এবং নিজের যুক্তিধর্মী, আদর্শধর্মী ভাবনার স্ফুরণ ঐ লোকসাহিত্য গ্রন্থটি। যেখানে ছেলেভুলানো ছড়া প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র ছড়া বা মেয়েদের ছেলে ভুলানো ছড়া, হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক উভয়ই ব্যতীত আর কিছুই বোঝেননি। তবে ঐ গ্রন্থে কবিওয়ালের গান এবং

গ্রাম্যসাহিত্যও স্থান পেয়েছে। এছাড়া তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের প্রতিটি ধারাতে লোকসাহিত্যের সুপ্তবীজ রোপন করেছিলেন। 'লোকসাহিত্যে' গ্রন্থে তিনি ছোটোবেলার ছড়ার আনন্দকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে – '' 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বাণ' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগীতা কী।''[১২] অর্থাৎ ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে ছড়ার রসকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তিনি স্বীকার করেছেন যে নিজের বাল্যস্মৃতিতে ছড়ার মাধুর্য কতটা, এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করছে, তা নির্ণয় করার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি তাঁর ছিল না। তিনি এটুকু ভেবেছিলেন, এই সকল ছড়ার অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোক গুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হয়ে আসছে। তবে এখানে এ কথা বলা যায় যে, যতদিন এই জনসমাজের অস্তিত্ব থাকবে ততদিন এর প্রবাহমানতা থামবেনা এমনটি নয়।

ছড়ার মধ্যে বাক্য ব্যবহার যদৃচ্ছাকৃত হলেও তার প্রতিটা পঙ্কতিতে পঙ্কতিতে মনমাতানো রসে ভরপুর, তা তিনি অন্তর দিয়ে উপভোগ করেছিলেন। তাঁর মতে – ''আমাদের অলংকার শাস্ত্রের নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদবেলকর গন্ধ, ...। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরসের নাম দেওয়া যাইতে পারে।''[১৩] তিনি এও বলেন যে এই রস সকলের কাছে প্রীতিকর না হতে পারে, সেটা রুচি ভেদের উপরে নির্ভর করে, সকলের পক্ষে এ রস আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

ছড়াগুলো যতই অর্থহীন ভাবে ব্যবহার হোক না কেন, বা এর সৃজনকর্তা কে বা কারা এবং এগুলি কোন কালের সৃষ্টি, তার পরিচয় না থাকলেও এ সকল ছড়ার মধ্যে একটা চিরত্বের আবেদন আছে বলে দাবি করেন রবীন্দ্রনাথ। একদিকে ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেমন ছড়ার চিরত্বের স্বরূপটি যথাযথ ভাবে পরিস্ফুট করেছেন, অন্যদিকে তেমনি শিশু মনস্তত্বেরও বিশ্লেষণ করেছেন অপূর্বভাবে। তবে শিশু প্রসঙ্গটি তিনি 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে – ''ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর কিছুই নাই। দেশকাল শিক্ষা প্রথা-অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজকৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহার মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।''[১৪] শিশুর জন্য ছড়ার সৃষ্টি, বয়স্কদের জন্য নয়। কারণ শিশুর কল্পনা চিত্রের সঙ্গে বয়স্ক লোকের কল্পনা কোনও ভাবে মেলে না। হয়ত কোনও একজন মা তাঁর শিশুকে ঘুমের দেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপন মনের কল্পনাতে এই ছড়া বেঁধেছিল। শিশুর মন যতটা নরম ঠিক যেন ততটা নরম ঐ ছড়ার পঙ্কতিগুলো। যা দিয়ে শিশু খুব সহজে ভুলতে পারে। কিন্তু বয়স্কের মনে তা ধরা পড়ে না।

ছড়ার মধ্যে চিত্রধর্মীতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কারণ শিশুর কল্পনার জগৎ যেন কোনও কিছুর মধ্যে ছবি আহরণ করে। সেই কারণে ছড়ার মধ্যে এমন সব শব্দ স্থাপন করতে হবে যাতে শিশু প্রত্যক্ষ ছবির

দর্শন পায়, তাহলে শিশুর হৃদয় নবনব আনন্দেও ভরে উঠবে। তাই মায়েরা যা তা শব্দ দিয়ে ছড়া বাঁধার সময়, সেই সব শব্দগুলো সংগ্রহ করে, যা শিশু নিজেকে একটি ছবির মধ্যে হারিয়ে ফেলে। হয়ত এই কাজটি মা অসচেতন ভাবে তৈরি করেন। এখানে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক, যেমন —

"খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।।"[১৫]

উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত পঙ্কতির প্রতিটি শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে শিশু মনে একটা নতুন ছবির আগমন ঘটে। খোকার মাছ ধরতে যাওয়া এবং কোলা ব্যাঙে ছিপ নিয়ে যাওয়া, উভয়ই শব্দগুলির মধ্যে একটা চিত্র শিশু মনে সহজে ধরা পড়ে, এবং শিশু মনকে ব্যাকুলিত করে তোলে। আবার –

"আয় আয় চাঁদমামা টী দিয়ে যায়।
.....।।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।।"[১৬]

উদ্ধৃতি চিহ্নের এই সব শব্দ সংযোগে বাক্যটি বলার মুহূর্তে শিশুমনে পলকের মধ্যে আকাশ থেকে চাঁদমামা এসে টীপ দিয়ে যাওয়ার ছবি জেগে ওঠে। মাছের মুড়ো, ধানের কুড়ো, কালো গরু, দুধ খাবার বাটি প্রভৃতির ছবি সে খুব সহজে চিনতে পারে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে আনন্দের উপলব্ধি জন্মায়। শিশুর এই কল্পনা শক্তির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দেবতার সাদৃশ্য দেখেছেন। তবে শিশুর কল্পনা অতীত বা ভবিষ্যৎকালের জন্য নয়, শুধুই বর্তমানকে

ঘিরে তৈরি হয়। তার কাছে বর্তমানই গৌরব। এছাড়া ছড়ার মধ্যে শুধুই শিশুর হাসি-কান্নার ছবি থাকে তা নয়, ছড়ার তুচ্ছ কথার মধ্যে বৃহৎ বাংলাদেশের মূর্তি, গ্রামের সাধারণ মানুষের গাওয়া সঙ্গীত, এবং একটি কুড়ে ঘরের আস্বাদ পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ 'ছেলেভুলানো ছড়া'তে বলেছেন,— "এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখ দুঃখ শতধা বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপরে বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল – অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখা সমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে – সে চিহ্ন আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে – কেহ খোস্তা দিয়ে খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই – তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে।"[১৭] অন্যদিকে তিনি আরও একটি ছড়ার মধ্যে পরিপূর্ণ রসের কথা তুলে ধরেছেন –

"আতা গাছে তোতা পাখি ডালিম গাছে মউ
হিরে দাদার মর মড়ে থান ঠাকুর দাদার বউ।"

ছড়ার রসে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে ছড়া সংগ্রহে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে 'ছেলেভুলানো ছড়া' প্রবন্ধের শুরুতে কেন তিনি ছড়া সংগ্রহ করেছেন, সে সম্বন্ধে তিনি জানিয়েছেন,— "বাংলার ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছু কাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলি বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।"[১৮] সমাজের

অতীত ইতিহাস এবং ছড়ার জাতীয় কাব্যের রস তাঁর কাছে সমগুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা।

ছড়া সংগ্রহে তিনি একা যুক্ত ছিলেন না। এই অদম্য ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাঁর চারিপাশের পরিচিতবর্গের মধ্যে ছড়া সংগ্রহের অনুরোধ করেছিলেন। এমনকি কাউকে কাউকে ব্যক্তিগত ভাবে পত্রও পাঠিয়েছিলেন। 'রবিজীবনী' গ্রন্থে প্রশান্ত কুমার পাল তা উল্লেখ করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে মিসেস পি. কে. রায় (সরলা রায়) কে চিঠিতে লিখছেন, -- ''ইংরাজিতে যেমন Nursery Rhymes আছে আমি সেইরূপ বাঙ্গালার সমস্ত প্রদেশের ছড়া সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কতক কতক সংগ্রহও হইয়াছে। আপনি যদি পূর্ববঙ্গ হইতে আপনাদের আত্মীয় পরিচিত কাহারো নিকট হইতে যথাসম্ভব আহরণ করিয়া দিতে পারেন তা বড় উপকার হয়। ছড়া যতই সামান্য তুচ্ছ এবং চলিত হউক না কেন আমার নিকট তাহা বহুমূল্য। এই সমস্ত ছড়ার মধ্যে আমাদের সমাজের অনেক প্রাচীন ইতিহাস ও দৃশ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং তুচ্ছ কথার মধ্যে গভীর কবিত্বের আস্বাদ পাওয়া যায়। যদি এরূপ সংগ্রহক্ষম কাহাকেও পান তবে তাঁহাকে বলিয়া দিবেন যেন গ্রাম্যতা অথবা কুরুচি দোষের জন্য কোন ছড়া বাদ না দেওয়া হয় এবং অর্থহীন শব্দসমষ্টিকে সামান্য জ্ঞান না করেন।''[১৯] এছাড়া তিনি বাড়ির আশপাশ থেকে ছড়া সংগ্রহও করার জন্য ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য সদস্যদের অনুরোধের সাথে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথ। তিনি শিলাইদহ থেকেও এক পত্রে অবনীন্দ্রনাথকে ছড়া সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেই পরিপেক্ষিতে অবনীন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন --- ''শিলাইদহে যখন রবিকাকা ছিলেন, আমায় লিখলেন যে – 'আমি এখানে ছেলেদের ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহ করছি, তুমি দেখতো কোলকাতায় দেশ বিদেশের রূপকথা সংগ্রহ করতে পারো কি না?' আমাদের বাড়ী ভরা ছিল

নানারকম গাঁয়ের লোক। তাদের ধরে অনেক ছড়া, রূপকথা প্রভৃতি সংগ্রহ করলুম।"[২০] আবার রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর থেকে ছড়া সংগ্রহের বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। তিনি কতটা সংগ্রহ করেছে, এর জন্য কাউকে অনুরোধ করেছেন, তা জানিয়ে তিনি লিখছেন, – "আজ তোমার কাছ থেকে আরো কতগুলো ছড়া পাওয়া গেল। বেশ লাগছে। এখানে আমাদের খাজাঞ্চির কাছ থেকে গোটা আষ্টেক ছড়া জোগাড় করেছি এবং যাকে পাচ্ছি তাকেই অনুরোধ করছি। তোমাদের বুড়ি দাসীটি কলকাতায় ফিরলে ভুলোনা।"[২১] অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে অন্য একটি পত্রে গগনেন্দ্রনাথকে ছড়া সংগ্রহ বিষয়ে সতর্ক করে লিখছেন, – "তোমাকে আমার সেই ছড়া সংগ্রহের কথা স্মরণ করাবার জন্যে এই পত্রখানি লিখছি – সে কথাটা যেন ভুলোনা এবং অধিক বিলম্ব করো না।"[২২] অর্থাৎ এ থেকে বোঝা যায়, ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহের জন্য তিনি প্রবলভাবে আগ্রহী হয়েছিলেন। কোনও ভাবেই তিনি লোকসমাজের জাতীয় সম্পত্তির প্রাচীন ইতিহাসতে শেষ হতে দেবেন না। এই গ্রাম-বাংলার সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যেন তাঁর মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের উল্লেখানুসারে রবীন্দ্রনাথ নিজে এবং অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় মোট ৮১টি ছড়া সংগ্রহ করেছিলেন। সংগৃহীত ছড়াগুলির বাল্যরস উপলব্ধির পর তিনি ঐ গুলো নিয়ে 'মেয়েলি ছড়া' নামে একটি প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন। সেই সংবাদ এবং ছড়ার রসোপযোগীতা নিয়ে ইন্দিরা দেবীকে একটি পত্রে তিনি লিখছেন, – "আজ সকালে বসে 'ছড়া' সম্বন্ধে একটা লেখা লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম – সেটার ভিতরে বেশ সম্পূর্ণ নিমগ্ন হতে পেরেছিলুম, বড়ো ভালো লাগছিল। 'ছড়ার একটা স্বতন্ত্র্য রাজ্য আছে – সেখানে কোনো আইনকানুন নেই – "মেঘরাজ্যের মতো। ..... লিখতে লিখতে হঠাৎ মাঝখানে আমলাদের একটা উপপ্লব উপস্থিত হল, আমার মেঘরাজ্য ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেল।"[২২] এই ছড়ার মধ্যে উপস্থিত কতছবি, সুখ দুঃখ

যেন তাঁর হৃদয়ের ভিতর দিয়ে ছুঁইয়ে গেছে। তিনি অন্তরের অন্তঃস্থল দিয়ে ছড়ার রসকে পান করেছিলেন। প্রসঙ্গ ক্রমে এ কথা উল্লেখ করা অতি আবশ্যক যে তাঁর 'মেয়েলি ছড়া' প্রবন্ধটি 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়। আর এই তুচ্ছ ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে কবির অন্তদৃষ্টির প্রবেশ ঘটেছিল। তাই রবীন্দ্রনাথ ছড়ার সমস্ত অর্থহীন অসংলগ্নতা তাতে এমন একটি অখণ্ড ভাবসূত্র বেঁধেছেন, তা যেন পাঠকের শৈশবকালীন সুখস্মৃতি আর মধুরতর হয়ে ওঠে। তাঁর ছড়া সংগ্রহের অদম্য ইচ্ছা মূলত রবীন্দ্রনাথের ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যেন সচেতন বুদ্ধির কার্যকরী ছিল। এছাড়া জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াশে তিনি বিভিন্ন সভাতে ছড়া নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন।

সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজ তথা সমগ্র সমাজের শিশুর জাতীয় সম্পত্তি ছড়া ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। যা বহুকাল সমাজের মাতৃভাণ্ডারে সুপ্ত অবস্থায় রক্ষিত ছিল। এমন সময় রবীন্দ্রনাথের দৃঢ় দৃষ্টি পড়ে শিশুর প্রাণস্বরূপ ছড়ার উপরে। পূর্বে কারোর চিন্তা-ভাবনায় এরকম ধারণা আসেনি। সেক্ষেত্রে তিনি যেমন ছড়াগুলি সংগ্রহ করেছেন, তেমনি তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন পাঠক সম্মুখে। এ সময় তিনি যেখানে থেকে যা পেয়েছেন, তা দুই হাতে সযত্নে সংগ্রহ করে রক্ষা করেছেন। পরিবর্তনের স্রোতে কোনও কিছু তিনি হারিয়ে ফেলেননি। সেকালের বাংলার বুক থেকে তিনি শুধুই মূল ছড়া সংগ্রহ করেননি। বেশ কিছু পাঠান্তর সংগ্রহ করেছিলেন। এ জাতীয় উপাদান তাঁর কাছে সবচেয়ে বেশী মূল্যবান। এমনকি এক-একটি ছড়ার এক বা একাধিক পাঠান্তর পাওয়া যায়। কারণ এক-একটি ছড়া লোকমুখে একস্থান থেকে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হতে হতে এরূপ পরিবর্তন ঘটেছে। তাতে প্রত্যেক অঞ্চলের ভাষার যে বৈশিষ্ট্য তা ছড়ার মধ্যে স্পষ্টতর হয়েছে। এরূপ ছড়া সংগ্রহে 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, – ''ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে; এই জন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ার বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো-একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারণ, এই কামাচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত।''[২৩] এই উদ্ধৃতি থেকে এটুকুই বোঝা যায় যে তিনি গুরুত্ব সহকারে শিশুর সম্পত্তিকে রক্ষা করেছেন, তা নষ্ট হতে দেয়নি। এ প্রয়াশ তিনি ব্যতিত বিশশতকে আর কারোর মধ্যে দেখা যায়নি।

ছড়ার আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শিশুসাহিত্য রচয়িতাদের একটি উপদেশ দিয়েছেন। অনেকে শিশুর আনন্দ অপেক্ষা প্রয়োজনসাধনকে অধিক গুরুত্ব দেন। তাঁরা কাব্যসাহিত্য ছড়া শিক্ষাজগতে অনেক ক্ষতি করে। সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, – ''ছেলেদের জন্য গ্রন্থরচনা ও নির্বাচন তাহার অন্যতম দৃষ্টান্ত। জগতে অতি সত্বরেই নীতি ও তত্ত্বপ্রচারের অধৈর্য্যে তাঁহার ছেলে ভুলানো কল্পনিক কথাগুলোকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করিয়া দিয়া নিরতিশয় আবশ্যকীয় শুষ্ক সত্য এবং উপদেশকে গ্রীষ্মমধ্যাহ্নে জল সংযোগ রহিত ছাতুর যত পিণ্ডাকার করিয়া গিলাইতে চেষ্টা করিতেছে। ..... আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন আমাদের জন্য তাঁর স্তনে ক্ষীরধার নিঃসৃত হইয়াছিল – তাহা এই ছড়া এবং রূপকথা, – তাহা কোন বুদ্ধিমানের উদ্দেশ্যকৃত স্বহস্তরচিত নহে, তাহা মাতৃস্নেহের অনন্ত প্রস্রবণ হইতে স্বতঃউৎসাহিত অমৃত ধারা।''[২৪] ছড়ার আলোচনায় তিনি যেমন গৌরব পেয়েছে, তেমনি কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে ঘরগড়া সমালোচনাও করেছেন। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় 'ছেলেভুলানো

ছড়া' প্রবন্ধে অনেক গুলো ছড়া প্রকাশিত হওয়ার পর সমালোচক হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন এ সম্পর্কে বলেছেন, – ''শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র বাবু দেশপ্রচলিত কতকগুলি ছেলেভুলানো ছড়া সংগ্রহ করিয়া দেশের কুরুচি ভাবের নিদর্শন করিয়াছেন। ছড়াগুলির অধিকাংশই নীরস, অনর্থক ও উদ্দেশ্যশূন্য। যদি কোনও বইয়ে সুকবি ছেলেদের জন্য ঈশ্বরের মহিমাসূচক স্বভাব বর্ণনা মূলক ও পরস্পরের প্রতি প্রণয়োদ্দীপক ছড়া রচনা করিতে পারেন, তাহা হইলে সেগুলি প্রচলিত হইলে দেশের মহোপকার সাধিত হয়।''[২৫] আসলে তিনি রসিক নন। যেকারণে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত মাতৃভাণ্ডারে জমা থাকা রসবড়া রূপ ছড়াকে তিনি নিরসে প্রতিপন্ন করেন। তার যোগ্য জবাব রবীন্দ্রনাথ তাঁকে দিয়েছেন।

।। তিন ।।

ছড়া আলোচনার প্রসঙ্গে রূপকথার বিষয়টিও এখানে উল্লেখযোগ্য। কারণ তিনি ছড়া ও রূপকথার উপাদানগুলো একত্রে সংগ্রহ করেছিলেন। এর পূর্বে কয়েকটি উদ্ধৃতি চিহ্নে আমরা তা উল্লেখ করেছি। এই রূপকথার গল্প রবীন্দ্রজীবনে একেবারে ছেলেবেলা থেকে গভীর ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঠাকুর মাকে টেনে নিয়ে বিছানায় বসে রাজকুমার ও রাজকন্যার গল্প শোনা ছিল যেন তাঁদের রোজকার ঘটনা। 'ছেলেবেলা' গ্রন্থে স্মৃতিচারণে তিনি বলেছেন, – ''বিছানায় ঢুকে এতক্ষণ পরে পাওয়া যায় একটুখানি পোড়ো সময়। সেখানে শুনতে শুনতে শেষ হতে পায় না – 'রাজপুত্তর চলছে তেপান্তর মাঠে' ....।''[২৬] বিছানার সহপাঠী বা দূরগ্রাম থেকে আসা বাড়ির দাসীদের কাছে গল্প শুনে তাঁদের মনে আনন্দের স্ফিহা জেগে উঠত। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চলত একটা টানাপোড়েন ও উদ্দীপনা। আর শেষ হলে সব নিস্তব্ধ, কিন্তু তাদের মনে ভাসতে থাকে সেই রাজকন্যা, রাজকুমার এবং জনহীন প্রকৃতির ছবি। তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, – ''রাত্রের আহার সারিয়া বাহিরের বারান্দায় জল দিয়া পা ধুইয়া একটা মস্ত বিছানায়

আমরা তিনজনে শুইয়া পড়িতাম – শংকর কিংবা তিনকড়ি আসিয়া শিয়রের কাছে রাখিয়া তেপান্তর মাঠের উপর দিয়া রাজপুত্রের ভ্রমণের কথা বলিত, সে কাহিনী শেষ হইয়া গেলে শয্যাতল নীরব হইয়া যাইত।"[২৭] মুহূর্তে আর কোনও উত্তেজনা থাকে না। এরপর তাঁরা ভাবতে থাকে রাজকুমার বা রাজকুমারীর জীবনে কি না ঘটে। নিজেদের জীবনের অনুভূতির সঙ্গে মিশিয়ে ভাবতে থাকে রাজকুমার বা রাজকুমারীর জীবনের সুখ দুঃখ ও আনন্দকে।

রূপকথার প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় একেবারে শিশুকাল থেকে। চারটের পর স্কুল থেকে ফেরার পর তিনি যখন বাড়ির ছাদের পিছনে দেখতেন ঘন সজল নীলমেঘ জমাট বেঁধে আছে। তখন তাঁর মনের মধ্যে এক নিমেষে আনন্দের জোয়ার এসে ধাক্কা দিত। সেই অভিজ্ঞতা থেকে তিনি 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থে বলেছেন, — "সেই মুহূর্তের কথা আজিও আমি ভুলিতে পারি নাই। সকালে জাগিবামাত্রই সমস্ত পৃথিবীর জীবনোল্লাসে আমার মনকে তাহার খেলার সঙ্গীর মতো ডাকিয়া বাহির করিত, মধ্যাহ্নে সমস্ত আকাশ এবং প্রহর যেন সুতীব্র হইয়া উঠিয়া আপন গভীরতার মধ্যে আমাকে বিবাগি করিয়া দিত এবং রাত্রির অন্ধকার সে মায়াপথের গোপন দরজাটা খুলিয়া দিত তাহা সম্ভব-অসম্ভবের সীমানা ছাড়াইয়া রূপকথার অপরূপ রাজ্যে সাতসমুদ্র তেরোনদী পার করিয়া লইয়া যাইত।"[২৮] এই ছেলেবেলার ভালো লাগা বা মন্দলাগার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল তাঁর কাব্যজগতে। শিশুকালে তেরোনদী এবং তেপান্তরের মাঠ পেরোনোর যে শরীর শিহরণ করা রস তিনি পান করেছিলেন, তা বাল্যকালে আবদ্ধ ছিল না। এছাড়া তাঁর চারপাশের পরিচিতদের কাছে যেসব রূপকথার গল্প শুনেছিলেন, সেই অনুভূতি তাঁর সাহিত্যের অঙ্গে অঙ্গে মেলে ধরেছেন। শোনা রূপকথার গল্প তিনি কিভাবে সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, – "অভি বলে আমার একটি ভাইঝি ছিল, তার গলা ছিল খুব মিষ্টি। একদিন কি একটা

কারণে আমার খুব রাগ হয়েছিল, অভি এসে আমার চৌকির পিছনে দাঁড়িয়ে চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ঠিক সেই সময়ে যা তা বলে গেল, এক মুহূর্তে আমার সমস্ত রাগ জুড়িয়ে গেল। সে আজ অনেক দিনের কথা, কিন্তু আজো মনে আছে। তারই মুখে রূপকথা শুনে আমি সোনারতরীতে বিম্ববতীর গল্প লিখেছিলাম। কবিতাটি 'রূপকথা' আখ্যায় চিহ্নিত।"[২৯] উল্লেখিত উদ্ধৃতি চিহ্নের বক্তব্য থেকে এটুকু নিশ্চিত যে তিনি ছাড়াও বাড়ির অন্যান্য সদস্যরাও মা পিসিমা বা বাড়ির বয়স্কদের কাছে রূপকথার গল্প শুনত। বাড়ির অন্তঃপুরে এ সবের চর্চাও চলত। রূপকথার প্রসঙ্গে সোনারতরীর বিম্ববতী কবিতা সম্পর্কে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন, – " 'বিম্ববতী'র কাহিনিটির সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় রূপকথার কিছু সাদৃশ্য আছে। ... 'বিম্ববতী'র কাহিনী এবং Cinderella-র কাহিনী উভয়েরই অভিপ্রায় (motif) অভিন্ন। .... কাহিনী নায়িকার 'বিম্ববতী' নামটি রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব প্রদত্ত, বাংলার কোন রূপকথার নায়িকা রূপে এই নামটি শুনতে পাওয়া যায় না।"[৩০] আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, তিনি এই রূপকথার গল্প ইউরোপের কোনও রূপকথার বই থেকে পড়েছিলেন। যার ফল তাঁর 'বিম্ববতী' কবিতা।

অন্যদিকে সাধনার পাতায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'কঙ্কাবতী'র সমালোচনা করলেও তাতে রূপকথা উপাদান ব্যবহারে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যথাযথ প্রশংসা করে বলেছেন, — "এই রূপ অদ্ভুত রূপকথা ভাল করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধা নিয়ম, কোন চিহ্নিত (যদ্দৃষ্টং) রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছাবিহারিণী কম্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়ম পথে পরিচালনা করিতে গুণপণা চাই। কারণ, রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসঙ্গত ও অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়ম-বন্ধনে বাঁধিত হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহা আর বাল্যসারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ, বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে

পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার নহে।"[৩১] তিনি মনে করেন, রূপকথাই শিশুর আকর্ষণ। যা শিশুকে মনোরঞ্জনে উৎসাহিত করে। এই উপাদান মিশ্রিত গ্রন্থ বা লেখা বালক বালিকাদের জন্য উপযুক্ত। তাই এর সন্ধানে তিনি অগ্রণী ভূমিকাও নিয়েছিলেন।

শিলাইদহে থাকা কালীন তিনি যে সমস্ত ইংরাজি বই পড়তেন তাতে তার মনের চাহিদা মিটতো না। তাঁর মনের চাহিদা কোন দিকে তা জানিয়ে ইন্দিরাদেবীকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন। সেখানে তিনি লিখছেন, ---- "এখানে এসে আমি এত এলিমেনটস অফ পলিটিক্স এবং প্রব্লেমস অফ দি ফ্যুচার পড়ছি ....। .... এখানে পড়বার উপযোগী রচনা আমি প্রায় খুঁজে পাই নে, ... বাংলার যদি কতকগুলি ভালো ভালো মেয়েলি রূপকথা জানতুম এবং সরল ছন্দে সুন্দর করে ছেলেবেলাকার ঘোরো স্মৃতি দিয়ে সরস করে লিখতে পারতুম তা হলে ঠিক এখানকার উপযুক্ত হত।"[৩২] শিলাইদহের পরিবেশ ইংরাজি কোনও তাত্ত্বিক লেখা পড়ার নয়, শুধু আনন্দায়ক অথচ গা ছম ছমে রূপকথা পড়ার অনুকূল পরিবেশ। হইত এরকম কোনও রূপকথার উৎস পাননি বলে সে সময় তিনি আপশোষ করেছেন। এরূপ আকাঙ্খা থেকেই তাঁর 'রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে' কবিতাটি লেখা, যে কবিতার উৎস হিসাবে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 'পুষ্পমালার রূপকথা'কে নির্দেশ করেছেন।

ছেলেবেলার রূপকথার যে অভাবনীয় কল্পনা তাঁর মনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ হয়েছিল তা আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। যেখানে তিনি জনহীন ধূ-ধূ পান্তর বা নিস্তব্ধ প্রকৃতি দেখেন, সেখানেই যেন রবীন্দ্রনাথ খুঁজে পান রূপকথার কল্পনা মেশানো রাজপুত্র ও রাজকুমারীর গল্প। উত্তরবঙ্গ থেকে সাজাদপুর বোটে রওনাকালীন সন্ধ্যা নেমে আসায় তিনি বোটটা নদীর চরে বেঁধেছিলেন, তখন তিনি অনুভব করেছিলেন নির্জন নদী ও গ্রামকে আচ্ছন্ন

করে সন্ধ্যা প্রাকৃতিক দৃশ্য। সেই মুহূর্তে তিনি মনে করেছিলেন, — "এ সমস্ত যেন ছেলেবেলাকার রূপকথার জগৎ – যখন এই বৈজ্ঞানিক জগৎ সম্পূর্ণ গঠিত হয়ে ওঠেনি, অল্পদিন হল সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে, প্রদোষের অন্ধকারে এবং একটি ভীতিবিস্ময়পূর্ণ ছম-ছম নিস্তব্ধতায় সমস্ত বিশ্ব আচ্ছন্ন – যখন সাত সমুদ্র তেরোনদীর পারে মায়াপুরে পরমাসুন্দরী রাজকন্যা চিরনিদ্রায় নিদ্রিত, যখন রাজপুত্র এবং পাত্ররের পুত্র তেপান্তরের মাঠে একটা অসম্ভব উদ্দেশ্য নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে – এ যেন তখনকার সেই অতি সুদূরবর্তী অর্ধ চেতনায় মোহচ্ছন্ন মায়ামিশ্রিত বিস্মৃত জগতের একটি নিস্তব্ধ নদীতীর।"[৩৩] এই রূপকথার প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণের দূর্বলতা ইন্দিরাদেবীকে একটি পত্রে জানিয়েছিলেন সাজাদপুরের উদ্দেশ্যে বোটে যাত্রাকালীন।

ছড়া সংগ্রহের মতো তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে ভিন্ন ভিন্ন লোকজনের কাছ থেকে রূপকথার উপাাদন সংগ্রহ করেছিলেন। সরলাদেবী, অবনীন্দ্রনাথ এবং গগনেন্দ্রনাথকে দিয়ে ছড়া সংগ্রহের পাশা-পাশি রূপকথার উপাদান সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধের পত্র এবং আদেশ করেছিলেন। এর দৃষ্টান্তগুলো আমরা পূর্বে ছড়া আলোচনাতে উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে তিনিও সমানতালে ওগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। এমনকি তিনি স্ত্রী মৃণালিনী দেবীদেও দিয়ে এই রূপকথার সংগ্রহ করিয়েছিলেন। ছড়া ও রূপকথা সংগ্রহ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, – "তিনি কাকীমাকে (রথীন মা)কে দিয়েও অনেক রূপকথা সংগ্রহও করিয়াছিলেন। কাকীমা সেগুলি একখানা খাতায় লিখে রাখতেন, তাতে অনেক ভালো ভালো রূপকথা ছিল। তাঁর সেই খাতাখানি থেকেই আমার 'ক্ষীরের পুতুল' গল্পটি নেওয়া।[৩৪] এ থেকে আমরা এই কথাটুকুই বলতে পারি যে, বাড়ির অন্তঃপুরে মহিলাদের মধ্যে ছড়া ও রূপকথার চর্চা অপরিহার্য ছিল না এমনটি নয়। রূপকথার গল্প শিশুর মনোজগতে বেশির ভাগ অংশ জুড়ে অবস্থান করে। এই গল্প তাদেরকে

সবকিছুতেই আকর্ষিত করতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ শিশুপাঠ্য লেখকদেরকে পরামর্শ দিয়েছেন, তাঁর মতে – ''শিশুদের কল্যাণ যাঁহারা কামনা করেন তাঁহার যেন কেবলমাত্র প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ভাগক্রমে বিশুদ্ধ সাধুভাষায় জ্ঞানশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা প্রচার না করিয়া চিত্রবিচিত্র কাল্পনিক কথা ও রূপকথা সংগ্রহ ও সৃজনপূর্বক শিশুদের হৃদয় সরস এবং তাহাদের শিক্ষার পথ সুন্দর এবং তাহাদের জীবনারম্ভকাল নবীন উষারাগে রঞ্জিত ও ছায়ান্বিত করিয়া তোলেন।''[৩৫] সংগ্রহের সাথে সাথে তিনি শিশু মনোমত সাহিত্য রচনা করার জন্য শিশুলেখকদেরকে অনুরোধের সঙ্গে সতর্ক করেছেন। তিনি মনে করেন শিশু যদি এরকম সাহিত্য পাঠ করে, তাহলে সব কিছু তার পক্ষে বোধগম্যে ও সহজসাধ্য হবে।

।। চার ।।

এবার আলোচনা করা যাক রবীন্দ্রনাথের কবিসঙ্গীত প্রবন্ধটি নিয়ে। মূলত সেখানে তিনি বলেছেন কবিওয়ালা এবং তাঁদের গান সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ কবিসঙ্গীত বা কবিওয়ালের গানকে লোকসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, সেক্ষেত্রে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে এই কারণে যে কবিগানগুলি পরিপূর্ণ ভাবে নাগরিক জীবনের ফলন্ত ফসল। এক যুগসন্ধিক্ষণে, সমাজের ক্ষয়িষ্ণু বিপর্যয় অবস্থার প্রেক্ষিতে রাজার রাজসভায় এবং হঠাৎ জমিদারি হাতে পাওয়া একদল বড়লোকের বাবু সমাজের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কবিওয়ালের গান জায়গা করে নিয়েছিল। যদিও এই জায়গার পরমায়ু ছিল অতিশয় অল্প। এর মধ্যে ক্ষণিক উত্তেজনা ছিল মুখ্য বিষয়। ভাবের গাঢ়ত্ব, ভাষা এবং গঠনের কোনও পারিপাট্যের দিকে কারোর নজর থাকে না। এই গান শুরু হওয়ার প্রথম পর্বে দুই দলের মধ্যে আগে থেকে বিষয়গুলি সাজিয়ে বা আলোচনায় পরস্পরের উত্তর-প্রত্যুত্তর তৈরি করে নিয়ে আসরে নামত। ফলে ব্যাপারটি একটি তাৎক্ষণিক আসরের রূপ নিত। সাহিত্যরস নয়, উত্তেজনার রসো চাহিদা ছিল প্রধান।

প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি বলেছেন যে প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে এই কবিওয়ালা এবং তাদের গানগুলির আবির্ভাব হয়েছিল, যা ধর্মভাবে উদ্দীপনা বা রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, মূলত এই গানের পৃষ্ঠপোষক ছিল সাধারণ শ্রেণির মানুষ, যাদের কাছে সাহিত্য রসের অপেক্ষা বেশি প্রয়োজনীয় ও আদরণীয় ছিল তাৎক্ষণিক উত্তেজনামূলক চমক। এ রকম ধারণা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো খুব অসংগত নয় যে মূলত সাধারণ মানুষের আবেগ ও অনুপ্রেরণায় এই গানগুলির সৃষ্টি হয়েছিল বলেই কবিগানকে রবীন্দ্রনাথ সংকোচহীন ভাবে লোকসাহিত্যে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কারণ লোকসাহিত্যে প্রধানত এই সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্খা এবং তাদেরই জীবনোপায় ধরে রেখেছে প্রতিটা পর্বে।

চাষি বা মাঝিদের আপন খেয়ালে গেয়ে যাওয়া লোকসঙ্গীতের মতো কবিগানগুলি গাওয়া হত না। তবুও সেই গানে মনোরঞ্জন যেন লোকসঙ্গীতের মতো উপভোগ্য। যা শ্রোতাদের মনে মুহূর্মুহূ আনন্দ এনে দেয়। পূর্বের কল্পনানুসারে উদ্রেকের রসমূলক শব্দসংযোজন করে গাওয়া হত। যার ফলে একই শব্দ বারবার আসে গানের মধ্যে। ছন্দ এবং বিশুদ্ধ ভাষার শব্দ চয়নের কোনও বালাই ছিল না। একে অপরের উত্তর প্রত্যুত্তরে যেমন খুশি, তেমন শব্দ গায়কেরা যোগ করতেন। এ প্রসঙ্গে কবিসঙ্গীত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, – ‘‘কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকতে এই – সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়।’’[৩৬] তিনি আরো সহজ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে শাক্ত ও বৈষ্ণব পদাবলীর পদগুলির আসল গুরুত্ব ঝেড়ে ফেলে অত্যন্ত তরল এবং ফিকে করে কবিরা সাধারণ মানুষ তথা স্রোতাদের কাছে অতি সহজে তুলে ধরেন। কখনো রাধাকে আবার কখনো তাঁর সখীদের, কখনো কখনো শ্যামকে নিয়ে কলঙ্ক রটিয়েছেন, আবার ছলনা ও গঞ্জনাও

করেছেন। যেন এগুলি কবিওয়ালাদের গান গাওয়ার সজীব আশ্রয়, এবং প্রধান বিষয়। অন্যদিকে তিনি কবিসঙ্গীত এর উপদান বিচার করতে গিয়ে নিজেই বলেছেন, -- ''অনুপ্রাস যখন ভাব-ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মুঢ় লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদদ্বার সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।''[৩৭] এই ইতরতা লোকসাহিত্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এখানে গ্রাম্যতা, কিন্তু স্থূলতা কিংবা আদিরস যদিও অল্প-স্বল্প থাকে কিন্তু ইতরতা সেভাবে লক্ষণীয় নয়। সেই প্রয়াশ পরিপূর্ণ ভাবে না থাকলেও কবিওয়ালাদের মধ্যে কিছুটা দেখা যায়। তারা গুণীজনের তৈরি ছন্দবদ্ধ ভাবেতে জল মিশিয়ে অত্যন্ত লঘুতর করে গণমনোরঞ্জনে নিবেদন করেন।

শুধুই শাক্ত পদাবলীর বা বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক-নায়িকার মান-অভিমান নিয়ে কবিগান তৈরি হয়নি, পিতামাতার প্রতি কন্যার অভিমানকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে এই কবিওয়ালের গান। এগুলি একেবারে বিকৃত করে সাধারণের উত্তেজনার মনোরঞ্জনে ব্যবহৃত। তবে মান-অভিমানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের তীব্রতা এবং জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা রক্ষিত এই কবিগানে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এ ধরণের অবসর রঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই বর্তমান থাকবে। তবে কবিগান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কবিসঙ্গীত প্রবন্ধের শেষে বলেছেন, -- ''নষ্ট পরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ এবং ইংরাজ রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।''[৩৮] আবার অন্যদিকে দক্ষিণেশ্বর নিবাসী শ্রী কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংগ্রহীত ও প্রকাশিত 'গুপ্তরত্নোদ্বার বা প্রাচীন কবি-সঙ্গীত সংগ্রহ' গ্রন্থের গানগুলি সমালোচনা করেন, এবং সমকালীন নাট্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, — ''কবিদলের গানে যে

প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য দেখা গিয়েছে, আধুনিক সংবাদপত্রে অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতে কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণ-স্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার এবং সর্ববিষয়ে রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, তাহার অবসর বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতা সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্টা দেখিতে পাইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[৩৯] সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ সেকালে রচিত ও অভিনীত প্রহসনগুলি সম্পর্কে এই মন্তব্য করেছেন। তিনি সাধারণের রুচির যে উন্নয়ণের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন। কবিগান নাগরিক সংস্কৃতিতে জন্ম নিলেও শহরের বুকে এইগুলি অস্তিত্ব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সভ্যতার নগরোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নব্য চেতনার জোয়ারে গানগুলি ভাসিয়ে নিয়ে গেছে সাধারণ মানুষের জীবনে। এই জনসাধারণ কবিগানকে একেবারে সমাদরের সঙ্গে নিজেদের জীবনে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। এই গ্রাম কবিগানকে গ্রহণ করল সম্পূর্ণ নিজস্ব রীতিতে।

।। পাঁচ ।।

'লোকসাহিত্য' গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধ 'গ্রাম্যসাহিত্য'। অর্থাৎ গ্রাম্যজীবনকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যের উদ্ভব। এই প্রবন্ধে গ্রাম্যসাহিত্য বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ছেলেভুলানো ছড়া, মেয়েলি ছড়া এবং নাগরিক সভ্যতা থেকে ধেয়ে আসা জনসাধারণের মধ্যে পরস্পরের মুখ থেকে শুনে, মুখে মুখে চর্চা করা রাধাকৃষ্ণ ও হরপার্বতীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ছড়া, আর আপন মনের খেয়ালে গেয়ে যাওয়া সাধারণ মানুষের মুখের গান, যা প্রবন্ধের বিষয়। প্রবন্ধের শুরুতেই তিনি পাবনা রাজশাহির সাধারণ মানুষের নিত্যপ্রবাহিত জীবনযাত্রার গেয়ে চলা গ্রাম্য ছন্দে বাঁধা গানকে তুলেধরেছেন, বারবার তাদের আবৃতি শুনে তিনি উদ্ধার করেছিলেন, –

"যুবতী ক্যান বা কর মন ভারী।

পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি।"[৪০]

শ্রাবণ মাসের কোনও একটি দিন পাবনা-রাজশাহিতে নৌকো করে ভ্রমণ করার সময়, প্রতিকূল প্রণয়নীয় প্রতি প্রেমিকের শান্তনা বাক্য গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ শুনতে পেয়েছিলেন। গ্রামের অখ্যাত কবির গানের ছন্দ সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, – "গানের সেই দুটো লাইনকে প্রচলিত গদ্যে বিনা সুরে বলিলে তাহার মধ্যে যে একটি রূঢ় দৈন্য আসিয়া পড়ে, ছন্দে সুরে তাহা নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া যায়; সংসারের প্রতিদিনের ধুলিস্পর্শ হইতে ঐ কটি তুচ্ছ কথা ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া উঠে।"[৪১] এই গ্রাম্য কবির গান ছন্দের বন্ধনে সুরের তালে মাঠে-ঘাটে জনপদের মুখে মুখে সজীব হয়ে আছে। কবির কথার ঝংকার যেন মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র গ্রামের চিত্রকে তুলে ধরেন। অখ্যাত কবির এই শব্দের খেলাকে তিনি বুঝতে ভুল করেননি। তাই যত্নসহকারে নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করেছেন।

গ্রাম্যকবিগণ জনসাধারণের প্রতিদিনের ভোগ করা আসা জীবনযাত্রাকে ছন্দের তালে গ্রামের হৃদয়কে নতুন ভাষা দান করেন। এই সাহিত্যের মধ্যে কল্পনার পাশা-পাশি আনন্দের সুর ও আছে। তিনি বলেছেন যে জনপদের চাষবাস, কামারের লাঙলের ফলা তৈরি, ছুঁতোরের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের হাতে মোটরি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে কাজের তালে একটা সাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছে। প্রতিদিন একটু একটু করে জমিয়ে নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রাম্যসাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব। এর চর্চা সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। এগুলি মূলত ছড়া আর গান, যা জনপদের কথা আকারে গ্রামবাসীর মনের মধ্যে বসে আছে সভ্যতা সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে। গ্রামবাসীদের সঙ্গে গ্রাম্যকবির একটা হৃদয়ের টান আছে। সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, – "আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিনদায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই; যদি পারিত তবে

তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিত"[৪২] কবি আর গ্রাম্যজনের নিছক সম্পর্ক নয়, তা যেন একটা হার্দিক সম্পর্ক। যা কবির পক্ষে কখনও ত্যাগ করা সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেন, – "গ্রামসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতি অপেক্ষা রাখে; সেই জন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আছে।"[৪৩] গ্রাম্যকবির ছড়া বা গান যতই ভাঙা ভাঙা ছন্দে হোক না কেন, যেন তা বাঙালিকে রসের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে।

অন্যদিকে নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যে একটি গভীর সম্পর্কে আবদ্ধ তা তিনি 'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তিনি স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে কবি ভারতচন্দ্র, কবিকঙ্কণ রাজসভার কবি এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ হলেও, তাঁরা গ্রাম্য ও দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে ছেড়ে বেশি দূর যেতে পারেন নি। তাঁদের গল্পগুলি গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরীর মতো অন্যান্য কাহিনি অবলম্বনে। তাই রাজসভার কাব্যের সঙ্গে ঐ গ্রাম্য ছড়াগুলির বিশেষ কিছু পার্থক্য ছিল না। তিনি আরো বলেন, যে নাগরিক সাহিত্যের শিকড়ের বিস্তার একেবারে স্বদেশের মাটি পর্যন্ত বিস্তৃত। মানুষের মুখে মুখে পরিবর্তিত হতে হতে এক সময় নাগরিক সাহিত্য তথা শিষ্ট সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে এই গ্রাম্য সাহিত্য। কোনও ভাবেই পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য রেখা টানা সম্ভব নয়। গ্রাম্য কবিগণ সম্পূর্ণ গ্রাম্য ধাঁচে হরগৌরি ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনি তুলে ধরেছেন। কবিদের বর্ণনায় দেবদেবীর কাহিনি যেন একান্ত সাধারণ, দিনমজুরের গল্প হয়ে উঠেছে লোকসমাজে।

ছড়া, রূপকথা এবং কবিগান সংগ্রহের মতো বাংলার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা গ্রাম্যসাহিত্য সংগ্রহের কর্মে তিনি নেমেছিলেন। তাঁর চলার পথে যতটা পেরেছেন ঠিক ততটার বেশি তিনি সংগ্রহ করেন অন্য হাতের মাধ্যমে। এই উপাদান সংগ্রহের জন্য তিনি কাউকে কাউকে অনুরোধ করেন এবং কিছু

লোকও নিযুক্ত করেন। গ্রাম্যসাহিত্য সংগ্রহের যে অভিজ্ঞতা তা তাঁরা রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিলেন যে, — ''প্রাচীনরা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। দুই একজন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়।''[৪৪] ঐ সময় ছড়া সংগ্রহ খুব সহজ ছিল না। কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে হইত দুই একটি ছড়ার খোঁজ পাওয়া যেত। তবে তা বর্ষীয়সীদের কাছে, আধুনিকদের কাছে নয়। এই বর্ষীয়সীরা গ্রাম্যসাহিত্যকে তিল তিল করে বাঁচিয়ে রেখেছেন।

।। ছয় ।।

মেয়েলি ছড়াগুলির মতো রবীন্দ্রনাথের কৌতূহলী দূরদৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তৎকালীন বাংলাদেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা মেয়েলি ব্রতকথাগুলির উপর। এই ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে বাংলার গ্রাম্য কুমারী-সধবা-বিধবারা তাঁদের ধর্মীয় সংস্কারকে বহন করতেন, এখনোও তা অনবরত ভাবে চলছে। ভারতী'র বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত রাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েলি ব্রত সম্পর্কিত 'ছট-পরব ও চকচন্দা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, — ''ছটপরব ও চকচন্দা বেহারে প্রচলিত দুটি মেয়েলি ব্রতের বিবরণ। লোকসাধারণের মধ্যে প্রচলিত এই সকল পরব ও ব্রতকথা ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। ইহাদের ভিতরকার মনস্তত্ত্ব ও ইতিহাস, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, রস এবং রহস্য আলোচনা করিবার পরম বিষয়।''[৪৫] লোকসমাজের অন্তর থেকে সৃষ্টি হওয়া প্রতিটা উপাদানের উপর তার দৃঢ়দৃষ্টি ছিল। তিনি শুধুই সংগ্রহ করেননি, সংগৃহীত বিষয়গুলি জনসমক্ষে আনার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশের ব্যবস্থাও করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় ব্রতকথা সংগ্রাহক অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের

কথা। তিনি গুটিকতক মেয়েলি ব্রত কথা সংগ্রহ করে তা প্রকাশ করেন। এতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ অসন্তোষ প্রকাশ করে এও বলেন যে এগুলির প্রকাশ যথেষ্ট নয়। তাই তিনি শান্তিনিকেতনের কর্মী অঘোরনাথকে দিয়ে 'রাম দুর্গা বা পূর্ণিমার ব্রত', 'দশপুত্তল ব্রত', 'হরিচরণ ব্রত', 'সাঁজপূজনী', 'মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত' প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়ে 'মেয়েলি ব্রত' শিরোনামে সংকলন করান। রবীন্দ্রনাথও সমানতালে ব্রতকথা সংগ্রহে ব্রতী হয়েছিলেন। এর শতাধিক প্রমাণ মেলে নিজের সম্পাদনা করা পত্রিকা গুলিতে। এই সূত্রে তিনি বলেছেন, – ''সাধনা পত্রিকা সম্পাদনকালে আমি ছেলেভুলাইবার ছড়া এবং মেয়েলি ব্রত সংগ্রহ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। ব্রতকথা সংগ্রহে অঘোরবাবু আমার প্রধান সহায় ছিলেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। অনেকের নিকট এই সকল ব্রতকথা ও ছড়া নিতান্ত তুচ্ছ ও হাস্যকর বলিয়া মনে হয়। তাঁহার গভীর প্রকৃতির লোক এবং এরূপ দুঃসহ গাম্ভীর্য্য বর্তমানকালে বঙ্গ সমাজে অতিশ্য সুলভ হইয়াছে।''[৪৬] লোক সাধারণের সমাজে অতিবাহিত ও চর্চিত সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে অতিমূল্যবান। এতে অতীত সমাজের জীবনযাপনের ইতিকথা লুকিয়ে আছে। এছাড়া তিনি দীনেন্দ্রকুমার রায়কে দিয়ে 'পৌষসংক্রান্তি', 'চড়ক সংক্রান্তি', 'বারতলার মেলা', 'পল্লীগ্রামে রথযাত্রা' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখান। এ থেকে স্পষ্টভাবে আমরা বলতে পারি যে তিনি সংগ্রহ নয়, নতুন সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে অতীত কালের সমাজ ব্যবস্থার ইতিহাসকে ধরে রাখার প্রয়াশও শুরু করেছিলেন। বঙ্গভাষা সাহিত্যে, এবং বঙ্গদেশের প্রচলিত গ্রাম্যজনের মুখে মুখে তৈরি অমৃতরূপ লোক উপদাদান শিষ্টসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। এ বিষয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন শুধুই তাই নয়, অন্যান্যদেরকে রক্ষার দায়িত্বও দিয়েছিলেন। এমনকি তাঁর অনুপ্রেরণায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর গ্রাম বাংলার ব্রতকথাগুলি সংগ্রহ করে 'বাংলার ব্রত' শিরোনামে 'ভারতী' (১৩২৫ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে বের করেন। এছাড়া গ্রাম্য সাধারণ মানুষ

জনের মধ্যে বছরের এক-একটি সময় যে আনন্দ ধারা বহন করে আনে গ্রাম্য মেলা-উৎসব, তাতে রবীন্দ্রনাথ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ঋতু উৎসব থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন পার্বণ, দোলযাত্রা এবং কৃষিমেলা প্রভৃতি লোকউৎসব পালন ও আয়োজন করেন। তাঁর কাব্যসাহিত্যের প্রতিটি হস্তাক্ষরের পাতায় পাতায় লোকসমাজে ব্যবহৃত ও চর্চিত নানা উপাদানের ব্যবহার দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বলা যায় প্রবাদ-প্রবচনের কথা, তিনি সাহিত্যের সব শাখাতে এর ব্যবহার করেছেন।

।। সাত ।।

রবীন্দ্রনাথ শুধুই সংগ্রহ করেননি, লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদন দিয়ে অন্যের লেখা বহু বইয়ের ভূমিকাও লিখেছেন। সেখানে তিনি বইয়ের ভালো-মন্দ দিকগুলিকে যথার্থভাবে নির্দেশ করেছিলেন। বাংলার রূপকথা সংগ্রহ বিষয়ক দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার এর 'ঠাকুর'মা ঝুলি' গ্রন্থে দীর্ঘ ভূমিকা লিখতে গিয়ে তিনি বলেন, – '' .... দক্ষিণাবাবুকে ধন্য, তিনি ঠাকুরমা'র মুখের কথাকে ছাপার অক্ষরে তুলিয়া পুঁতিয়াছেন তবু তাহার পাতাগুলি প্রায় তেমনি সবুজ, তেমনি তাজাই রহিয়াছে। রূপকথার সেই বিশেষ ভাষা, বিশেষ রীতি, তাহার সেই প্রাচীন সরলতাটুকু তিনি যে এতটা দূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম রসবোধ ও স্বাভাবিক কলা নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।''[৪৭] তিনি শুধুই রূপকথার কল্পনা রসবোধের দিকে খেয়াল করেননি। তার গঠনগত শৈলীর দিকে তাঁর দৃঢ় দৃষ্টি ছিল। আবার এই রূপকথা বিষয়ে বিভূতিভূষণ গুপ্তের 'বেড়াল ঠাকুরঝি' কুড়িটি গল্পসংকলন গ্রন্থের ভূমিকা লেখেন। এখানে তিনি স্পষ্ট দাবী করেন যে এ সমস্ত রূপকথা অখ্যাতনামী গ্রাম্য মহিলাদের রচনা। প্রতিদিনের ঘরকন্যার কাজে মহিলাদের মুখে মুখে ব্যবহৃত কল্পকাহিনি যা তারা লেখার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। এ যেন বাংলাদেশের গ্রামের অন্তঃপুরের কাহিনি। এ গল্পগুলিতে রসের আধিক্য অনেক

পরিমাণে বেশি। গ্রন্থের লেখক মূলত বর্ষীয়সী আত্মীয়দের মুখ থেকে শুনে লিখেছেন। অন্যদিকে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন এর বাংলার পল্লীসঙ্গীতের বৃহৎ সংগ্রহ গ্রন্থ 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকা লিখেছিলেন। ঐ খণ্ডে মূলত বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের গাওয়া গানের সংগ্রহ। এই মুখবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের আসল তত্ত্ব এবং গানের প্রতি তাঁর আসক্তি উল্লেখ করেন। 'হারামণি'র পঞ্চম খণ্ডের ভূমিকায় লেখক বলেছেন, – ''রবীন্দ্রনাথই ১৩২২ বঙ্গাব্দে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত লালন ফকিরের গান-সংগ্রহ প্রকাশ করেন। এই গানগুলি দেখেই আমি সর্বপ্রথম প্রবৃত্ত।''[৪৮] এতে তিনি আরো বেশি উৎসাহিত হয়ে 'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ড লেখেন। এই খণ্ডের ভূমিকা লেখার জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানালেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য রবীন্দ্রনাথ লিখতে পারেননি। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা শ্রীযুক্ত অনিলবাবু তাঁর গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে লেখার অনুমতি পেয়েছিলেন পত্রের মাধ্যমে। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন শুধুই গ্রন্থের ভূমিকা লেখায়নি, বা রবীন্দ্রনাথের লেখায় শুধুই অনুপ্রেরণা পায়নি, এই সুবৃহৎ সংগ্রহ কাজের জন্য তিনি তাঁর কাছ থেকে আর্শীবাদ চেয়েছিলেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ একবাক্যে একটি শুভকামনা প্রেরণ করেন। সেটি হল, -- ''তোমার গ্রাম্যগীতি সংগ্রহের অধ্যাবসায় সফলতা লাভ করুক এই আমি কামনা করি।''[৪৯] এছাড়া তিনি অন্যান্য বইয়ের ভূমিকা লেখার পাশা-পাশি অন্যদেরকে দিয়ে লিখিয়েছেন এবং সংগ্রহও করিয়েছেন। এই কৃতিত্ব লোকসংস্কৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অন্তরের সম্পর্কিত একটা পরিচয়বাহী।

।। আট ।।

বাউল সঙ্গীত লোকসাহিত্যের অন্তর্গত লোকসঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম। বাউল শুধুই সঙ্গীত নয়, লোকসাধারণের 'মন' নামক তত্ত্বের ব্যাখ্যা কর্তা। মানুষের মনকে কেন্দ্র করে এই সংগীতের পথ চলা। তাই রবীন্দ্রনাথ

বাউলগান সম্বন্ধে 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকা বলেছেন, – ''ভাষার সরলতায় ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলে না। তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি বাক্যরচনা, তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া বলে বিশ্বাস করিনে।''[৫০] নাগরিক সাহিত্য নয়, গ্রাম্য তথা সাধারণ নিরক্ষর মানুষের কথায় রবীন্দ্রনাথ রসের ভাণ্ডার খুঁজে পেয়েছিলেন। লোকসাহিত্যের প্রতিটা পর্বে তাঁর হস্তক্ষেপ এবং সেখান থেকে নিরসের মধ্যে রসের উৎস টেনে জনসমক্ষে আনা যেন তাঁর একটা তাগিদ ছিল। কারণ গ্রাম বাংলায় চলার পথে সৃষ্টি বহুমূল্যবান বস্তুকে অবহেলা করতে তিনি চাননি। যা তাঁর পূর্বে অযত্নে অনেক কিছু অবক্ষয়িত হয়েছে। বাউল গানের প্রতি রবীন্দ্রনাথের একটা মানবিক দূর্বলতা ছিল, তা নিজেই বার বার স্বীকার করেছেন। এই বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর পরিচয় সম্ভবত জমিদারি পরিদর্শনের সময়, অর্থাৎ শিলাইদহে থাকাকালীন। যদিও এ বিষয়টি নিয়ে বিজ্ঞজনদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নেই। এ প্রসঙ্গে জলধর সেন 'কাঙ্গাল হরিনাথ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে বলেছেন,— ''শুনিয়াছি কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিলাইদহের কুঠিতে লালন একবার গান করিয়া সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন তিনটা পর্য্যন্ত গান চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে কেহই স্থান ত্যাগ করিতে পারে নাই।''[৫১] রবীজীবনীকার প্রশান্তকুমার পাল মহাশয় বলেছেন, যে উপরের উদ্ধৃতি চিহ্নে ব্যবহৃত বক্তব্যের কোনও লিখিত প্রমাণ নেই যদিও, কিন্তু কলকাতার রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ানো শিলাইদহের বাউলকে তিনি খুব সহজে চিনতে পারেন। যা রবীন্দ্রনাথ 'হারামণি' গ্রন্থের ভূমিকাতে তা উল্লেখ করেন। এ থেকে অতিসহজে অনুমান করা যায় শিলাইদহের রবীন্দ্র বাসভবনে বাউল সম্প্রদায়ের আসা-যাওয়া ছিল। এমনকি তাদের সঙ্গে তাঁর বাউলের বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনাও চলত। তিনি এতটাই বাউলের প্রতি অনুরাগী যে বাউল

সুরে অনেকগুলি গান রচনা করেছিলেন। এই সঙ্গীতের ঐতিহাসিক মূল্যকে হারিয়ে যেতে দেননি। বাউল সম্প্রদায়ের মুখের যে অবয়ব তা তিনি গানের মধ্যে তুলনা ধরেন। এবং ধরে রাখেন বাউল গানের মূলতত্ত্ব কথাকে।

পূর্বেই বলেছি বাউল গান মানুষের দেহ ও মনের ব্যাখ্যা কর্তা। তাই মানব দেহের মধ্যে আত্মরূপী ভগবানকে বাউল গানে 'মনের মানুষ' আখ্যা দিয়েছেন। এই কারণে বাউল গানে 'মনের মানুষ' কথাটি বিশেষ ভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত। বাউলের কাছে মানুষ তুচ্ছ নয়, এমনকি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এই গান সবার জন্য। অর্থাৎ মানুষের মনের মধ্যে সদাসত্য ভাগবানের আসন অধিষ্ঠিত। এই উপলব্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয় গ্রন্থে বলেছেন,– '' .... বিশ্বদেবতা আছেন, তাঁর আসন লোকে লোকে, গ্রহ-চন্দ্র তারায়। জীবন দেবতা বিশেষ করে জীবনের আসনে, হৃদয়ে হৃদয়ে তার পীঠস্থান, সকল অনুভূতি সকল অভিজ্ঞতার কেন্দ্রে। বাউল তাকেই বলে মনের মানুষ।''[৫২] এভাবে এরই ব্যাখ্যা করা যায় যে মানুষের মনই বাউল সাধনার প্রধান অবলম্বন। মনের মধ্যে সাধনাই হল বাউল সাধনা। এই মতাদর্শে বিশ্বাসী হয়ে রবীন্দ্রনাথ বাউল সুরে গান লেখেন, এবং মনের মানুষ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এতেও সফল। তিনি আত্মপরিচয় গ্রন্থে এও উল্লেখ করেন যে নিজে বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছেন, এবং তাদের গানের খাতা দেখেছেন। এছাড়া তিনি এমনটি বলেন যে বাউল গানে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে, যা চিরকালের জন্য আধুনিক। আবার বাউলের এই মনের মানুষের সন্ধান রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনের বাউল গীতি সংগ্রহ থেকে উদ্ধার করেছেন। তিনি চর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োগ ও সংগ্রহ করেন। এই গ্রাম্যগীতি সংগ্রহ বিষয়ে তিনি 'ভারতী'তে পাঠক এবং ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলেন, – ''যদি কেহ কেহ নিজের সাধ্যানুসারে প্রচলিত গ্রাম্যহীত সকল সংগ্রহ করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করেন তবে তাহা ভারতীতে সাদরে প্রকাশিত হবে।''[৫৩]

আপামোর জনসাধারণের কাছে তাঁর এই নিবেদন। বাংলার যে প্রান্তে থেকে যা পেয়েছেন, তা তিনি সংরক্ষণের সাথে সংগ্রহ করেন।

শিলাইদহের জমিদারি সূত্রে লালন ফকিরের ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা গভীর যোগছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অনুষ্ঠিত একটি ছাত্র সভায় ছাত্রদের কর্তব্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, – ''আর একটি বিষয়-সেটা আমার ঔৎসুক্যের বিষয়। সেটা ছোট ছোট নূতন ধর্মপ্রচারকদের জীবনী সংগ্রহ করা। মফস্বলে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাই যে হয়ত পল্লীর নিভৃত ছায়ায় কোনো ব্যক্তি নতুন ধর্মসম্প্রদায় সংগঠন করিতেছে। ..... আমি এইরূপ একজন ধর্মপ্রচারকের বিষয় কিছু জানি-তাঁহার নাম লালন ফকির।'' এই পরিচয় থাকায় পরে রবীন্দ্রনাথ বাউলের আসল তত্ত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন। পূর্বে নিজেই বলেছেন এই রকম বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত আলোচনা চলত। তাই বাউল গানের রত্নাকর লালন ফকিরের সঙ্গে তাঁর যোগ থাকাটাই স্বাভাবিক।

শুধুই এই লালন বা বাউল গানের সঙ্গে নয়, লোকসাহিত্যের যাবতীয় শাখা-প্রশাখার সঙ্গে তাঁর আজন্মকালের পরিচয় ও সুগভীর সম্পর্ক ছিল। এ নিয়ে পণ্ডিত মহলে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই। তিনি পথে হাঁটতে হাঁটতে হাতের কাছে যা পেয়েছেন, তাই নিজেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংগ্রহ করেন, এবং অন্যদিকে লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারকে ভরপুর করে তুলতে প্রয়োজনাতি পরিশ্রম করেছেন। এ বিষয়ে তিনিই প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ, সে নিয়ে কোনও

তথ্যসূত্র ঃ

১। মিত্র সমাদ্দার, দিবাকর, 'লোকসাহিত্য রবীন্দ্রমননে ও সৃষ্টিতে' পুস্তক বিপণি, কলকাতা,
২০০৩, পৃষ্ঠা - ১৭

২। মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য', সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা,
দ্বিতীয় সংসকরণ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১

৩। মিত্র সমাদ্দার, দিবাকর, 'লোকসাহিত্য রবীন্দ্রমননে ও সৃষ্টিতে' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃষ্ঠা - ১৭

৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮

৫। মজুমদার, মানস, 'লোকঐতিহ্য-চর্চা' দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১০, পৃষ্ঠা - ১১

৬। রসুল, খালেদ মাসুকে, 'নোয়াখালীর লোকসাহিত্যে লোক-জীবনের পরিচয়', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃষ্ঠা - ৩২

৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ২৮

৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ হিরন্ময়, 'ঠাকুরবাড়ির কথা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-১১৬

৯। মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'লোকসাহিত্য গবেষণা পত্রিকা' ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ লোকসংস্কৃতি চর্চার মুখবন্ধ, ২৩/১ বৈশাখ-আশ্বিন, ১৪১৭, পৃষ্ঠা - ১৯৬

১০। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পূণর্মুদ্রন বৈশাখ, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা - ৯১

১১। চক্রবর্তী, বরুণকুমার এবং মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পাদনা), 'বাঙালার লোকসংস্কৃতি', অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ১৯৯৬, পৃষ্ঠা-১২ (প্রস্তাবনা)

১২। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পূণর্মুদ্রন বৈশাখ, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা - ৬

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩১

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২-৩৩

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯

১৯। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (৩য় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ২৬৯

২০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭১

২১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭২

২২। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ২৬

২৩। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পূণর্মুদ্রন বৈশাখ, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা - ৫০

২৪। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ২৭

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা - ৩০

২৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'ছেলেবেলা' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ৪৪

২৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (একাদশ খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, ... পৃষ্ঠা - ৩৭
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬
২৯। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (৩য় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ২০২
৩০। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫৮
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা - ২০২
৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ১৮৩
৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৭২
৩৫। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ২৭
৩৬। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'লোকসাহিত্য' বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, পূণর্মুদ্রন বৈশাখ, ১৪১৯ (বঙ্গাব্দ), পৃষ্ঠা - ৮০
৩৭। তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯
৩৮। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৬
৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৫
৪০। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৭
৪১। তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৯
৪২। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯০
৪৩। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯০
৪৪। তদেব, পৃষ্ঠা - ৯২
৪৫। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (পঞ্চম খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ৫

৪৬। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (চতুর্থ খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা - ১২১

৪৭। মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লোকসাহিত্য', সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংসকরণ ২০০৫, পৃষ্ঠা - ১৭

৪৮। মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'লোকসাহিত্য গবেষণা পত্রিকা' ঃ রবীন্দ্রনাথ ঃ লোকসংস্কৃতি চর্চার মুখবন্ধ, পৃষ্ঠা - ২৩

৪৯। তদেব, পৃষ্ঠা - ২৮

৫০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, 'লোকসংস্কৃতি রত্নাকর' (তৃতীয় খণ্ড), এ. মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা - ১৩৪০

৫১। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (৩য় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৪০

৫২। মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত), 'রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতি চর্চা' বিশেষ সংখ্যা, কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৯, পৃষ্ঠা - ৬০০

৫৩। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (দ্বিতীয় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা - ১৭৪

৫৪। পাল, প্রশান্ত কুমার, 'রবিজীবনী' (৩য় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃষ্ঠা - ১৪০